গোবু গোবিন্দ

মনন দাস

গোবু গোবিন্দ

মনন দাস

পরিবেশক

লিপিকা

৩০/১ এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

Gobu Gobinda
by Manan Das

প্রকাশক ঃ বউল পাঁজা
৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ি স্ট্রীট
বালী, হাওড়া ৭১১২০১

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ শৈলেন পাত্র

মুদ্রক ঃ লোনস্টার সল্যুশনস
৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

ঃ উপহার ঃ

তাপস সেন
চম্পা সেন

লেখকের অন্যান্য ই-বইঃ

কবিতা সংগ্রহ
www.archive.org/details/KobitaSangraha

White Flowers
www.archive.org/details/WhiteFlowers

গল্পঃ
অন্যস্বাদ
www.archive.org/details/AnyaSwad

গল্প পঞ্চক
www.archive.org/details/galpa-panchak

উপন্যাসঃ
মনভূমি
www.archive.org/details/Manabhumi

ঝলমলি
www.archive.org/details/Jhalmali

কিশোর উপন্যাসঃ
রাজু নারানের কীর্তি
www.archive.org/details/RajuNaranerKirti

ছড়ায় লেখা মজার গল্পঃ
আটটা ঠাট্টা
youtube search Manan Das / Four Fun
youtube search Manan Das / More Four Fun

প্রথম পর্ব

গোবু গোবিন্দ গোবর্ধন
শৈশব কৈশোর যৌবন



রূপকথার রাজ্যে কিশোর

বাড়ির সামনে ওলা ট্যাক্সি থেকে নেমে ডিকি থেকে ট্রলিব্যাগ নামানোর সময় পিছন থেকে – হ্যাঁ গোবু, তোমার মামার কাছে শুনলাম তুমি নাকি চায়না গিয়েছ, তা আজই ফিরলে বুঝি ?

পিছন ফিরে গোবু অর্থাৎ গোবিন্দ – যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে প্লেনে ওঠার বোর্ডিং পাশ নেবার সময়ও ছিলেন গোবিন্ডা বোস পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন মামাবাবুর বন্ধু বঙ্কুবাবু, বাজারের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গোবিন্ডা বোস অনুধাবন করল পাড়ায় ঢুকে আবার সে যথারীতি গোবিন্দ - গবা - গোবু হয়েছে।

– হ্যাঁ কাকাবাবু, এই ফিরলাম।

– শরীর ঠিক আছে ?

– হ্যাঁ ঠিক আছি।

– কিন্তু তোমার ঘড়িটা তো বারোটা বেজে গেছে ! এখন সবে তো সাড়ে নটা !

– ও ! তাই তো ! আসলে চায়না টাইম আমাদের থেকে আড়াই ঘণ্টা এগিয়ে রাখতে হয়েছিল – ঘড়ি মেলাতে যাবে এমন সময় গাড়ির হর্ণ।

ইতিমধ্যে কখন আরেকটা ট্যাক্সি ঢুকে পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা হর্ণ দিয়েছে।

এ রাস্তায় পাশাপাশি দুটো গাড়ি সহজে যাবেনা। একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ালে যেতে পারে, কিন্তু তার ট্যাক্সি একটু মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছে। পিছনের ট্যাক্সিতে বেশ কয়েকজন যাত্রী, অধৈর্য। জানালা দিয়ে একটি মেয়ের মিষ্টিমুখ উঁকি দিল। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে সরে দাঁড়াল। তার ট্যাক্সি একটু এগিয়ে ধার ঘেঁষে দাঁড়ালে পিছনের ট্যাক্সি এগিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু তাকিয়ে গোবিন্দ মুখ ফেরাল – আসছি কাকাবাবু – একটু হেসে, একটু ঘাড় কাত করে বিনয়ের সঙ্গে বলল গোবিন্দ।

– এসো, ঘড়িটা মিলিয়ে নাও, তোমাকে খোঁচা দিতে গিয়ে আমিই দেখছি বোকা বনে গেলাম – বঙ্কুবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সদর দরজা খোলাই ছিল, দরজায় পা দিয়েই গোবিন্দ একেবারে অন্তঃস্থল থেকে ডাক দিল – মা-আ-

– গোবু এলি ! আয় বাবা আয়। কালী বলছিল সকালের দিকেই ফিরবি, বাজারে গেল মাছ আনতে – বলতে বলতে মৃণ্ময়ী এগিয়ে এলেন, গোবিন্দ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, মৃণ্ময়ী গোবিন্দর চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে চুমু খেলেন।



ছোট বেলা থেকে নিজের নাম নিয়ে গোবিন্দ খুবই বিব্রত। বিশেষতঃ ছোট বেলা থেকে ডাকনাম গবু, গবা ইত্যাদিতে সে এতই পর্যুদস্ত ছিল যা কহতব্য নয়। এর জন্য ছোটবেলা থেকেই সে মুখচোরা আর ঘরকুনো স্বভাবের। তার ওপর পদবী বোস! স্কুলের বন্ধুরা বলত – চেপে গবা, চেপে, চেপে বোস!

ছেলেবেলায় তার সঙ্গী ছিল ছবির বই, রূপকথা।

তার মামাবাবুর কলেজস্ট্রীটে প্রায় দিনই যাতায়াত, হামেশাই নানান বই এনে দিতেন, সেসব গল্প আর ছবির মধ্যে বুঁদ হয়ে হারিয়ে যেত কোন অজানা রূপকথার দেশে। স্বপ্নে এসে তারা শিহরণ জাগাত। তারপর কল্পবিজ্ঞান আর গোয়েন্দা গল্প, বিশেষতঃ সত্যজিৎ রায়ের বইগুলি! এভাবে সে অন্তরমুখি।





নিজের নামের ওপর নিজের কোনো হাত নেই। জন্মাবার পর ওটা কপাল দেগে দেন মা বাবা পাড়া প্রতিবেশী বা গুরুদেব। তারপর যখন তোমার নামের ভাল মন্দ নিয়ে বাছবিচারের সময় হলো তখন স্কুলের খাতা থেকে শুরু করে রেশন কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদিতে স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে নাম! তখন যতই ছটফট কর ততই কাবু হয়ে পড়বে। তবে হ্যাঁ, মুখচোরা আর ঘরকুনো হয়ে গোবিন্দ লেখাপড়ায় অধিক অধিক মনোযোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ অতিক্রম করে পড়াশোনা শেষে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। বিদেশের কোম্পানীতে যোগ দেবার সুযোগ এসেছিল কিন্তু দেশী কোম্পানীতেই যোগ দিয়ে স্বস্তি পেয়েছে, সংসারে মা আর মামা, তাঁরাও স্বস্তিতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। যদি ছেলেটা বিদেশে যাবার কথা ভাবত তাহলে কি যে হতো! যদিও সে সম্ভাবনা 'প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাস মাইনাস'!

গোবিন্দর মামা কালী বাবু, কালী চরণ ঘোষ। কালী বাবুর বাবা অর্থাৎ গোবিন্দর দাদু তাঁর মেয়ের নাম রেখেছিলেন মৃণ্ময়ীকালী আর ছেলের নাম রেখেছিলেন

কালীচরণ। কালী বাবু বলেন – আহা বাবা যদি ছেলের নাম রাখতেন মৃণ্ময়কালীপদ তাহলে মৃণ্ময় নামটাই রয়ে যেত, কত সুন্দর হতো! কবি হিসাবে মৃণ্ময় নামটা কেমন কাব্যিক! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কালী বাবু ছড়াকার, একটি লিটিল ম্যাগাজিন করেন, এ বাড়িতে অধিষ্ঠিত। বিয়ে থা করেননি। মানে করা হয়ে ওঠেনি। নবযৌবন কাল থেকে কবিতা লেখা মক্সো করতে করতে বি.এ. পাস করে চাকরিবাকরির ধান্দাটান্দা না করে লিটিল ম্যাগাজিন করে টুকটাক লেখালেখি করতে করতে বাবা চলে গেলেন, কিছুদিন পর মাও চোখ বুজলেন। তখন অথৈ জলে! তারপর অত বড় বাড়িতে একা, কে রান্না করে কে খায়! অতঃপর বাড়ি বিক্রি করে দিদি জামাইবাবুর কাছে। তখন বয়স পঁয়তাল্লিশ।

কিন্তু বিদেশ যাত্রা গোবিন্দর কপালে লেখা আছে, যাকে বলে সেই 'কমলি নেহি ছোড়তা' প্রবাদের মতো 'বিদেশ নেহি ছোড়তা'! চাকুরিতে যোগ দেবার বছর দুয়েক পর যখন গোবিন্দ কর্মদক্ষতায় যথেষ্ট কেরামতি দেখিয়ে সুনাম অর্জন করল তখন কর্তৃপক্ষ গোবিন্দকে আরও দায়িত্বশীল করার জন্য চায়নার যে কোম্পানির সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ – মানে – মেশিনপত্র আমদানি করা হয় সেখানে দিন পনের-র জন্য জ্ঞান আহরণ করে আসতে বললেন।

সে এক দুঃসহ অবস্থা! সেদিন ছিল রবিবার, সকালে মামাবাবু গলদা চিংড়ি এনেছেন, মৃণ্ময়ী যত্ন করে মালাইকারি রেঁধেছেন, পেটুক গোবিন্দ বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছে। যদিও রবিবার তবু দুপুরে জরুরি মিটিং আছে তাই দেরি করেই অফিস যেতে হবে – গোবিন্দ বেশ হাসিখুশি, সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফিরে থেকে একেবারে চুপচাপ আর মুখ গোমড়া! রাতে খেতে বসে সকালের মালাইকারি নেড়েচেড়ে খেল না।

– কি হল গোবু? খেলিনা কেন? – মা জিজ্ঞাসা করলেন।

– কেমন গন্ধ লাগছে।

– সে কি রে? আমি যত্ন করে ফ্রিজে তুলে রেখেছি, এবেলা গরম করলাম!

– হ্যাঁ, সুগন্ধ ভুরভুর করছে, তোর কি খারাপ লাগছে? – মামাবাবু বললেন, কিন্তু গোবিন্দ খেলনা।

গোবিন্দর আরেকটি গুণ সে খাদ্য রসিক। খেতে সে খুবই ভালবাসে। সে হেন গোবিন্দ এমন মালাইকারি অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করায় মামাবাবু বেশ বিস্মিত হলেন, তবে বেশি চিন্তা না করে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে দুবাটি মালাইকারি খেতে

লাগলেন, কারণ খাওয়ার ব্যাপারে তিনিও ভাগিনার মতো সমান রসিক।

গোবিন্দ মুখ ধুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে সোফায় বসল। এটা তার নিত্যকার অভ্যাস। সকালে ভাল করে কাগজ পড়বার সময় হয়না তাই। কিন্তু কাগজ না পড়ে দেওয়ালে মাটির টিকটিকিটার দিকে নাকি প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে রইল কে জানে!

মামাবাবু খাওয়া শেষ করে আঙুল চাটতে চাটতে ছড়া সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলেন ঃ

গোলবাগানের গোবু বাবু গন্ধ বিচার করেন
সুগন্ধ আর দুর্গন্ধের সীমারেখা ধরেন
মনোলোভা মালাইকারি গন্ধ শুঁকে দেখে
রসনা সম্বরণ করেন একটুও না চেখে!

গোবিন্দ গোমরা মুখে উঠে ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

আসলে হয়েছে কি দুপুরে অফিসে মিটিংয়ে জরুরি আলোচনার বিষয়বস্তু হল গোবিন্দকে চায়না যেতে হবে, অন্তত দিন পনের থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোবিন্দর বস – মানে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের চিফ ম্যানেজার শান্তনু সেন বললেন – শোনো, কাল তোমার পাশপোর্টটা নিয়ে আসবে, ভিসার জন্য লিখতে হবে।

– পাশপোর্ট? পাশপোর্ট তো নেই স্যার।

– নেই মানে?

– মানে দরকার নেই তো, তাই করা হয়নি।

– সে কি হে? এখন ঠ্যালাওয়ালা রিক্সাওয়ালাও পাশপোর্ট রাখে আর একজন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার, আর এন্ড ডি ডিভিশনের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার বলছে তার নাকি পাশপোর্টের দরকার নেই! তোমার তো এক্ষুনি চাকরি যাওয়া উচিত!

– না মানে ইয়ে – গোবিন্দ একেবারে গোবু হয়ে যায়, কিছু বলতে পারে না।

– কাল তোমার আধার কার্ড প্যান কার্ড নিয়ে আসবে, এসব আছে তো? না তাও নেই?

– হ্যাঁ আছে।

সেই থেকে গোবিন্দর মাথায় বজ্রপাত আর পেটের ভেতর গুরুগুরু গর্জন! জল পর্যন্ত ভাল করে খেতে পারছে না।

পরদিন সকালে প্রায় না খেয়েই পোশাক আশাক পরে প্যান কার্ড আধার কার্ডের খোঁজ পায়না, — মা আমার আধার কার্ড প্যান কার্ড কোথায় ?

— কেন রে, সবাইয়ের কার্ড তো ওই একটা প্যাকেটেই থাকে। — মৃণ্ময়ী এসে হাত লাগালেন — এই তো, এখানেই রয়েছে, কি হবে ?

— পাশপোর্ট করতে হবে, কোম্পানি বলেছে পনের দিনের জন্য চায়না যেতে হবে — প্রায় কেঁদে ফেলে সে।

— চায়না ? সে আবার কোথায় ?

— চায়না মানে চিন গো, চিন দেশ, ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের কবিতা পড়নি ! আরশোলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চিনারা ! — মামাবাবু পাশ থেকে উদয় হলেন।

— সেকিরে ? তাহলে খাবি কি ?

— বিস্কুট খাবেখন, ছোটবেলা থেকে ওতো বিস্কুট খেতে খু-উ-ব ভালবাসে — মামাবাবু উদার গলায় উৎসাহ দিলেন।

— আহা, এতদিন ধরে বিস্কুট খেয়ে থাকা যায় নাকি ? — মৃণ্ময়ীর হতাশ কণ্ঠ।

— তা কি করা যাবে, তোমাকে তো সঙ্গে পাঠাবেনা ! আর যদিও পাঠায় সেখানে কোথায় রান্নাঘর আর কোথায় গলদা চিংড়ি। আহা এইজন্য কাল তুমি অমন মালাইকারিটা খেলে না গোবু !

— আঃ আমার চিন্তায় পেট গুরগুর করছে, আর তোমরা খাওয়া নিয়ে চিন্তা করছ।

— তা বললে তো হবে না গোবু ! খাওয়া হচ্ছে ভাইটাল ব্যাপার ! বিশেষতঃ তুমি আবার খেতে ভালবাসো !

— ঠিক সেই কথাটাই বললেন ম্যানেজার মিঃ সেন, বললেন, — বুঝলে বোস, খাওয়াটা হচ্ছে ভাইটাল ব্যাপার ! ওরা আদুড় বাদুড় সাপ ব্যাঙ থেকে শুরু করে সব খায়। প্রথমবার আমি যখন গেলাম, — হ্যাঁ ফ্যাকট্রির পাশেই ওদের বিরাট গেষ্ট হাউস আছে, ওখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, এলাহি ব্যবস্থা, সেসব নিয়ে চিন্তা নেই, কিন্তু খাওয়া ? প্রথম দিন একজন অফিসারের সাথে লাঞ্চে গেলাম। ভাতের সঙ্গে মাটনকারি। কেমন কেমন লাগছিল, তবু খেতে হল। খাওয়া শেষে সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন — হাউ ইজ দ্যাট মিট য়ু হ্যাভ টেকেন ?

আমার মোটেই ভাল লাগেনি, তবু ভদ্রতার খাতিরে বললাম — সো সো।

— ডু য়ু নো হোয়াট ইজ দ্যাট ? — তারপর নিজেই বললেন — ডনকি — বলে সে কি হাসি।

গাধার মাংস খেয়েছি শুনে আমার তখন গা গুলোচ্ছে, কোনক্রমে সামল দিলুম।

শুনে গোবিন্দর ভিমরি খাওয়ার অবস্থা!

— তা বুঝলে কিনা, ওনারা ডগ থেকে ডনকি সবই খান! সব সময় চিকেন চাইবে, আর ওমলেট, ভাত পাবে, বয়েল্ড ভেজিটেবল, স্যালাড, চাওমিন পাবে। আর একটা কাজ করতে পারো, ঘি দিয়ে ভাত খাও?

— হ্যাঁ স্যার, গোবিন্দ উৎসাহিত! — সঙ্গে সরু সরু আলুভাজা।

— ব্যাস ব্যাস, এক শিশি গাওয়া ঘি নিয়ে যাবে আর তোমার ওই সরু সরু আলুভাজা। প্রথমে ওই দিয়ে খানিকটা ভাত খেয়ে নেবে।

এত কথা বলে সেন সাহেব একটু থামলেন, একটু চুপচাপ, তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, — তবে কি জানো, খাওয়া নিয়ে যত রসিকতা করিনা কেন ওটা যে যার নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে — আপ রুচি খানা — আসল কথা হচ্ছে কাজ! ওই দেশে গেলে বুঝতে পারবে ওদের অগ্রগতি। চোখে পড়বে উন্নয়ন। এটাই আসল, আর এজন্যই আমাদের ছুটতে হচ্ছে ওদের পিছনে। ওখানে শিক্ষিত লোকেরাও কেউ ইংরাজি বোঝেনা। ওদের নিজেদের ভাষা এত উন্নত যে তার মাধ্যমেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক তৈরি হয়। খুব কম দুএকজন ইংরাজি বলতে পারেন বা বোঝেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইন্টারপ্রিটারের — মানে দোভাষীর কাজ করেন। তোমাকে ওরা একজন ইন্টারপ্রিটার দেবে, তিনি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবেন, কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, তৈরি হও।

তৈরি হবে কি, গোবিন্দ মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে ডাকতে লাগল যাতে তেনারা পাশপোর্ট আটকে দেন, মায়ের ঠাকুর ঘরের সামনে রোজ বিড়বিড় করতে লাগল। কাণ্ড দেখে মামাবাবু একটা ছড়া লিখে ফেললেনঃ

অপিসের কর্তা ধরেছেন বায়না
গোবুকে পাঠাইবেন চ্যাংচুং চায়না
হবে যে গোবিন্দ ইন্টারন্যাশানাল
নাম হবে গোবিন্ডা, আমাদের কি কপাল!

শুধু লেখা নয়, সেটা আবার টেবিল ঠুকে গাইছেনও!

গোবিন্দর এত প্রার্থনা বিফল করে কর্মদক্ষ রায়বাবু অতীব তৎপরতায় পাশপোর্ট তৈরি করিয়ে ফেললেন, শুধু গোবিন্দকে একবার পাশপোর্ট অফিসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ওটা নিতে হবে।

সেদিন আর গোবিন্দর অফিস যাওয়া হল না, মুখ কাচুমাচু করে মাকে বলল, একটু পরে বেরোবো, পাশপোর্ট অফিস যেতে হবে।

—তাই নাকি! —মামাবাবু বললেন, একটা ছড়া কাটলেন ঃ

মুখচোরা গোবুবাবু যাবেন যে চায়না
মুখ দেখে মনে হয় তাড়া করে হায়না!

বিকালে বাড়ি ঢুকলে মামাবাবু সাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, বললেন — পাশপোর্ট পাইচুং? একটু দেখাচুং?

গোবিন্দ রেগেমেগে পাশপোর্টটা মামাবাবুর হাতে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। মামাবাবু দরজায় এসে দাঁড়ালেন, পাশপোর্টটা কপালে ঠেকিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন — রাগ কোরোনা গোবু, আজ থেকে তুমি আন্তর্জাতিক হবার ছাড়পত্র পেলে, এগিয়ে চল, তোমার এই অগ্রগতিই তো আমরা চেয়েছি! তৈরি হও, এগিয়ে চল।

অবশেষে গোবিন্দকে তৈরি হতেই হলো। সেন সাহেব তাঁর চেম্বারে ডেকে আরেক প্রস্থ জ্ঞান দিলেন, — তোমার ফ্লাইট রাত বারোটা তিরিশ মিনিটে। প্লেনে উঠে তোমার ঘড়িতে আড়াই ঘণ্টা যোগ করে নেবে, মানে তিনটে। আড়াই ঘণ্টা লাগবে, সকালে পৌঁছে যাবে সাড়ে পাঁচটায় কুনমিং। ওখান থেকে বেজিং যাবার আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা অন্তর প্লেন আছে প্রায় সারাদিন ধরে রাত পর্যন্ত। ভাবা যায়! যাই হোক, তোমার প্লেন বেলা আটটায়, দুপুরে বেজিং পৌঁছবে। সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে, মানে সাড়ে এগারোটা, বেজিংয়ে নেমে বাইরে আসবার গেটে তোমার জন্য লোক অপেক্ষা করবে, তার হতে থাকবে ইংরাজিতে তোমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড, তার কাছে গিয়ে তোমার পরিচয় দেবে, সে তোমাকে গাড়িতে নিয়ে যাবে। যেখানে যাবে সে শহরটা বেজিং থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ, সেখানেই ফ্যাক্টরি, গেষ্টহাউস সব। ঠিক আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—যথেষ্ট শীতের পোশাক নেবে, এখানে এত গরম, কুনমিং-এ নেমেই বুঝবে কি ঠাণ্ডা, ছোটবেলায় ভুগোল পড়েছ মনে আছে? হিমালয় উত্তুঙ্গ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে শুষ্ক উত্তুরে বাতাসকে আটকে রেখেছে, তাই আমাদের দেশ এত সবুজ আর সুজলা সুফলা। — পড়েছি কিন্তু মনে ছিল না। — শুকনো গলায় বলল গোবিন্দ।

—এখন সশরীরে বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, ক্যাশিয়ার মিঃ দাশগুপ্তকে বলা আছে, ডলার নিয়ে নেবে, ওখানে গিয়ে দোভাষীকে বলবে তিনি ডলারগুলি ওদের টাকায়

বদল করে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

গোবিন্দর মাথা ভোঁ ভোঁ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

সহসা টেবিলে ঝুঁকে পড়ে গোপন কথা বলার মতো নীচু স্বরে সেন সাহেব বললেন – বেজিংয়ে তোমার কোনো কাজ নেই, ফেরার সময় তোমাকে বেজিং পৌঁছে দিয়ে ওদের দায়িত্ব শেষ। ওখান থেকে তোমার কুনমিংয়ের প্লেনে ওঠার কথা। তুমি তাই করবে তিনদিন পর।

একি রহস্য গল্প! গোবিন্দর মাথায় ভোঁ ভোঁ সাইরেন হয়ে গেল, কিছুতেই থামাতে পারলনা। তিনদিন ধরে বেজিংয়ে কি ফেলুদা হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে? – ব্যাপারটা বোঝো, বেজিং যাচ্ছো আর কিছু না দেখেই চলে আসবে? জীবনে আর দেখার সুযোগ হবে কিনা!

ব্যাপারটা বেশ ফিসি! সেন সাহেব নিজেই ফেলুদা হয়ে গেছেন! গোবিন্দ ভাবল – আবার তিনদিন! কি দরকার এসব ঝামেলায়! ঘরের ছেলে সোজা ঘরে ফিরে আসবো।

– অন্তত চিনের প্রাচীর আর ফরবিডন সিটি আর মাওসেতুং? – সেন সাহেব রসহ্য উন্মোচন করলেন – তিন দিন থেকে ঘুরে বেড়িয়ে নেবে। আমি এটা যোগ করে দিচ্ছি।

– চিনের প্রাচীর! আহা! চিনের প্রাচীর! কৈশোরে পড়া আর ছবিতে দেখা সেই রহস্যময় দেওয়াল – নিষিদ্ধ নগরী – সেই রাজপ্রাসাদ – প্রবেশ নিষেধ – সেখানে ফুলের উদ্যানে ঘুরে বেড়ায় রাজকন্যা!

ছেলেবেলায় মামাবাবু কলেজ স্ট্রীট থেকে তার জন্য কিনে আনতেন সুন্দর সুন্দর বই তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিল চাইনিজ বইগুলি। পাতাভর্তি ছবি নীচে দুই এক লাইন গল্প। সে ছবিগুলির গাছপালা মানুষজন যে কি অপূর্ব! কল্পনায় তার মধ্যে হারিয়ে যেত সে! চিরকাল সে বইয়ের খুব যত্ন করে। একটু নোংরা করে না, একটুও পাতা ছেড়ে না। ছোটবেলার সেসব বই মা ভাল করে মলাট দিয়ে তুলে রেখেছে।

উনি কি সব বলছেন? গোবিন্দর মাথার মধ্যে যেন জলতরঙ্গ বাজছে – দেখব? চিনের প্রাচীর? রাজপ্রাসাদ?

– এটা ধরে নাও কোম্পানির জন্য তোমার বিশেষ পরিশ্রমের বোনাস। অবশ্য লাক্সারি হোটেলে থেকে খরচ নয়, কোম্পানীর দিকটাও আমাকে দেখতে হবে। কেউ



নিষিদ্ধ নগরী – সেই রাজপ্রাসাদ – প্রবেশ নিষেধ



– সেখানে ফুলের উদ্যানে ঘুরে বেড়ায় রাজকন্যা!

না সমালোচনা করতে পারে। কম খরচে ভাল হোটেল, কিন্তু একেবারে শহরের কেন্দ্রে বলতে পার। হোটেল থেকে তিয়েনমেন স্কয়ার, ফরবিডন সিটি বাসে গেলে দশ মিনিট, টিউব রেলে আরো কম, হেঁটে গেলে পনের কুড়ি মিনিট। অন লাইন বুকিং আমি করে দিয়েছি, ভাল করে সব বুঝে নাও।

গোবিন্দর মনে কেমন এক উত্তেজনা, – এসব উনি কি বলছেন ? ফুরফুরে এক আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে মনে ও শরীরে –

– ফিরবার আগের দিন তোমার দোভাষীকে ওই হোটেলের নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে দিয়ে বলবে যে ড্রাইভার তোমাকে বেজিং পৌঁছে দেবে তাকে যেন ভাল করে বুঝিয়ে দেয় ওই হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য, নাহলে মুশকিলে পড়ে যাবে। ট্যাক্সি নিয়ে খুঁজতে হবে, টাকা খরচ হবে, ভোগান্তি হবে।

– চারিদিকে নিঝুম পাহাড় বিস্তৃত কতদূর – পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে দুর্ধর্ষ দেওয়াল – তার ওপর দিয়ে পথ – ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যাওয়া – সে যেন পৌঁছে গেছে কৈশোরে —

– থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার – গভীর আবেগে বলে উঠল। তার মনের সব আড়ষ্টতা আর ভীতি কোথায় উধাও ! ঘোড়াটা কোথায় যেন টগবগ করছে, পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটলেই হয় !

দেখে সেন সাহেবের মুখে স্নেহের হাসি। কদিন ধরে গোমড়া মুখের ছেলেটা যেন চকোলেট পেয়ে খুশিতে ডগমগ ! – প্রসিড অন, গুড বয়, প্রসিড অন – আবেগ ভরে বললেন তিনি।

– থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ! – আবার বলল গোবিন্দ, উঠে দাঁড়াল, সেন সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলেন, গোবিন্দ দুহাতে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

– উইস ইয়োর গুডলাক ! – মৃদুস্বরে বললেন সেন সাহেব।

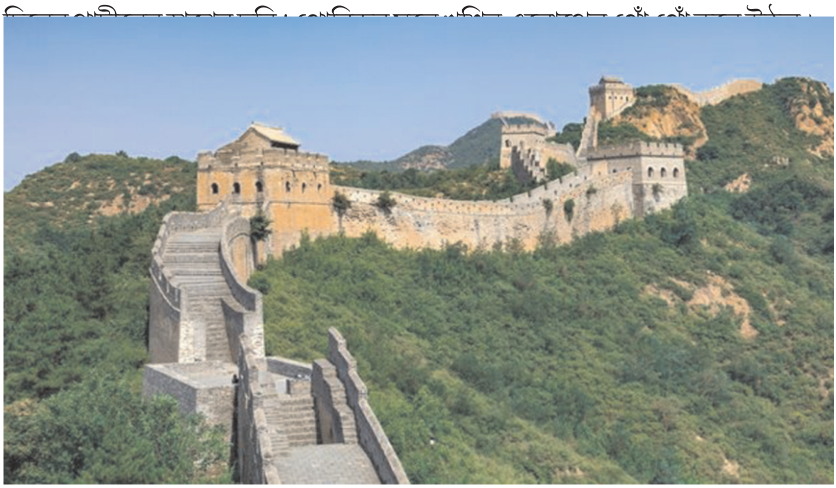
বাড়ি এসে গোবিন্দর সে কি উৎসাহ ! চিৎকার করে বলল – মা, আমার সব শীতের পোশাক লাগবে। বার করে দাও।

মৃণ্ময়ী অবাক, ছেলেটার কি মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেল ? ও কালী, – ভাইকে ডাকলেন তিনি – দেখ এসে, গোবু শীতের পোশাক চাইছে।

– তা তো লাগবেই, ও দিদি, চায়নায় শীত যায়না।

মোবাইল খুলে গোবুবাবু মহা উৎসাহে নেট সার্চ করতে বসে গেলেন, ম্যাপ খুলে

দস্তুর মতো জ্ঞান আহরণ! কলকাতা থেকে পূর্ব দিকে সোজা বাংলাদেশ পেরিয়ে তারপর মায়নামার, সেটা পেরিয়েই তো চায়না বর্ডার, একটু পরেই কুনমিং। ওঃ! সেখান থেকে বেজিং অনেক দূর, উত্তর পূর্ব দিকে চিনের প্রায় শেষ প্রান্তে। তারপর



অবশেষে পাসপোর্টের গোবিন্ডা বোস সাহেব বেজিংয়ে উপনীত হলেন। এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লাল কার্পেট মোড়া প্যাসেজ পেরিয়ে এলে এয়ার হোস্টেস বেশ মোটাসোটা একটা খবরের কাগজ হাতে ধরিয়ে দিল। এক পলক তাকিয়ে গোবিন্দর মাথায় হাত, চিনা ভাষার কাগজ! এটাকে গায়ে দিতে হবে না মাথা ঢাকতে হবে বুঝতে না পেরে ভাঁজ করে চটপট কাঁধ ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল তারপর ফাইবার গ্লাস আর স্টিলে মোড়া এক বিশাল অলকাপুরী। এর মধ্যে মানুষগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে পিঁপড়ের মতো। কোন ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করেছে! আমি এক তুচ্ছ ইঞ্জিনিয়ার।

গ্লাসের দেওয়ালের বাইরে তাকাল। হঠাৎ বুকটা এমন ধকধক করে উঠল! মনে হল সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র খেলনা এরোপ্লেন যতদূর চোখ যায়। মাথাটা কেমন ভোঁ ভোঁ করছে, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। এসব পেরিয়ে কোথায় যাব, কোন দিকে? অতীব নার্ভাস হয়ে গোবিন্দ সামনে এগিয়ে চলল। সামনে একটা কনভেয়ার ঘুরছে, তাতে নানা রঙের ছোট বড় লাগেজ, লোকেরা টপাটপ তুলে নিচ্ছে, অবশেষে ফাঁকা! যাঃ বাবা! তার অমন নতুন

কেনা লাল রঙের সুন্দর ট্রলি ব্যাগ গেল কোথা? এই ঠাণ্ডাতেও গোবিন্দর কপাল ঘামতে শুরু করল, কেউ নিশ্চয় ওটা নিয়ে পালিয়েছে। হতভম্ব সে শূন্য কনভেয়রের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সহসা পিঠে যেন কার স্পর্শ, ফিরে তাকাল – এক বৃদ্ধ চিনা ভদ্রলোক, তিনি ইশারায় গোবিন্দর হাতে ধরা টিকিট দেখিয়ে একটু তফাতে আরেকটি কনভেয়রের পাশে একটা পোস্টের মাথায় লেখাটা দেখাল – সেখানে তার ফ্লাইট নম্বর ঝলমল করছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখল সবাই চলে গেছে একমাত্র তার ট্রলিব্যাগ একা মহানন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে! তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোক স্মিত হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। – থ্যাঙ্ক ইউ – বলল গোবিন্দ। ভদ্রলোকের কোটটা চেনা চেনা লাগছে, প্লেনে তার সামনের সিটে বসেছিলেন মনে হচ্ছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবার চারিদিকে তাকাল, আরো কতগুলি কনভেয়ার যে ঘুরছে! সবার মাথায় ফ্লাইট নম্বর লেখা। একসাথে কত প্লেন ঢুকছে রে বাবা!

বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার।

– হ্যাঁ মামা, আমি বেজিং পৌঁছেছি। গলা কাঁপছে? হ্যাঁ, খুব নার্ভাস লাগছে! কি বিশাল এয়ারপোর্ট! মা কে দাও, হ্যাঁ মা ভাল আছি, চিন্তা কোরোনা, পরে আবার ফোন করব।

অতঃপর ব্যাগ টানতে টানতে নিষ্ক্রমন গেটের দিকে, আবার পেটের মধ্যে গুরুগুর, যদি কেউ না আসে? কিন্তু না, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে গেটের ওপারে উঁচু করে ধরে রাখা প্ল্যাকার্ড, তাতে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা গোবিন্ডা বোস।

(মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান দেখিয়া তৃষ্ণার্ত পথিকের মনে যেরূপ অনুভূতি জাগ্রত হয় তাহাকে নির্দিষ্ট কোনো বিশেষণে ভূষিত করা যায় না, অতএব তাহা হইতে বিরত থাকাই ভাল।) গোবিন্ডা সাহেব সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন।

পীত বর্ণের একজন মধ্যবয়সী মহিলা, তার পাশে গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে প্ল্যাকার্ড। তাঁরা এগিয়ে এসে হাসিমুখে দুবার মাথা ঝুঁকিয়ে নিহাও নিহাও করে কি যেন বললেন। গোবিন্দ কি করবে বুঝতে না পেরে অমনই দুবার মাথা ঝুঁকিয়ে দিল।

– গুড মর্নিং স্যার, আর ইউ মিষ্টার গোবিন্ডা বোস? আই হ্যাভ সিন ইয়োর

ফোতো, আই অ্যাম য়ুকি, ওয়েলকাম টু আওয়ার কান্ট্রি – মহিলা বললেন।

ভদ্রলোক হেসে তার হাত থেকে ট্রলি ব্যাগের হ্যান্ডেলটা ধরে নিলেন এবং চলতে শুরু করলেন। তারপর লিফট, নেমে এল আন্ডার গ্রাউন্ডে। শত শত গাড়ি, তার মধ্যে একটা গাড়ির কাছে এসে য়ুকি দরজা খুলে তাকে স্বাগত জানালেন, গোবিন্দ উঠলে তিনি উঠলেন, ভদ্রলোক ড্রাইভারের আসনে বসলেন, কেমন অনায়াসে শত শত গাড়ির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গাড়ি বার করে আনলেন তারপর খুলে গেল যাদু নগরীর দ্বার, এক আশ্চর্য শহরের পথে ছুটে চলল গাড়ি, অপূর্ব সব



দ্বিতীয় পর্ব

গোবিন্ডার চিন ভ্রমণ



গেস্ট হাউসের দোতলায় একটি সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরে গোবিন্দকে ঢুকিয়ে দিয়ে য়ুকি বললেন – তেক রেস্ত ফর সাম টাইম, দেন তেক ইয়োর বাথ, আই উইল কাম আফতার ওয়ান আওয়ার, দেন উই শ্যাল গো ফর লাঞ্চ। আফতার লাঞ্চ উই শ্যাল গো তু মিত উইত জেনারেল ম্যানেজার।

ধীরে ধীরে বলা য়ুকির কথাগুলি বুঝতে কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে না, গোবিন্দ স্বস্তি বোধ করল। জুতো মোজা খুলে ধপধপে সাদা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ ঠাণ্ডা, পায়রে দিকে ভাঁজ করে রাখা সাদা ওয়াড় ঢাকা কম্বল, কিন্তু ওটা কি?

বিছানা থেকে বেরিয়ে একটা তার আর প্লাগ সুইচ বোর্ডে লাগানো। যদিও সুইচ অফ করা রয়েছে। উল্টে দেখল। ইলেকট্রিক কম্বল মনে হচ্ছে! ও বাবা! এটা চালিয়ে তো ভাবনায় ঘুম হবে না। যাই হোক, আপাততঃ একটু লম্বা হওয়া যাক।

তারপর তো ঘটল সেই বিপত্তি! ডাইনিং রুমে গোল টেবিল, তার উপর একটু উঁচু করে ছোট আরেকটা কাচের গোল টোবিল, তার ওপর নানা পাত্রে নানা পদের খাবার। সবই অচেনা।

কাচের গ্লাসে জল দিল বেয়ারা, এক চুমুক খেতে গিয়ে গোবিন্দ বুঝল ঈষৎ গরম। চিনামাটির দুটি বড়বড় বাটিতে গরম গরম ভাত দিয়ে গেল, সাথে দুটি ড্রাম বাজানোর মতো লম্বা লম্বা কাঠি। য়ুকি চাকতির ওপর রাখা পদগুলি থেকে দুএকটি পদ ভাতের ওপর তুলে নিয়ে চাকতিটি একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন – তেক তেক!

গোবিন্দ বুঝল চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাবার তুলে নিতে হবে। কিন্তু এই কাঠি! – প্লিজ গিভ মি এ স্পুন – অসহায় ভাবে বলল সে।

– ও ইয়েস – বেয়ারাকে কি যেন বললেন য়ুকি, সে একটা চিনামাটির চামচ দিয়ে গেল। এবার গোবিন্দ তার প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে ঘিয়ের শিশি বার করে ভাতে ঘি ঢালল।

– হোয়াট ইজ দিস? – মুখ কুঁচকে নাকে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন য়ুকি, মনে হচ্ছে ঘিয়ের গন্ধ তার ভাল লাগছে না।

– দিস ইজ এ মিল্ক প্রোডাক্ট, মেড ফ্রম বাটার – মুখ কাচুমাচু গোবিন্দর।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হাসলেন য়ুকি, বললেন – প্রসিড অন।

গোবিন্দ আলুভাজা ঢালল, – দিজ আর পোটাটো চিপস – য়ুকির সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বলল গোবিন্দ, তৃপ্তিতে খেতে লাগল। খুবই খিদে পেয়েছিল, বেশ

খানিকটা খাওয়ার পর মুখ তুলে দেখল য়ুকি কেমন কাঠি দিয়ে ভাত খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা ওটা তুলে নিচ্ছে। ভাতটা অবশ্য নরম আর দলাদলা, কাঠি করে বেশ তোলা যাচ্ছে।

— ইজ দেয়ার এনি চিকেন প্রিপারেশান ? — গোবিন্দ সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল।

— নো স্যার, সরি স্যার, আই শ্যাল অ্যারেঞ্জ ইট ফর ডিনার। ডু ইউ লাইক ওমলেট ?

— ও, ইয়েস ইয়েস।

য়ুকি বেয়ারাকে কি যেন বলল, একটু পরে সে ছোট ছোট লুচির সাইজের কতগুলি ওমলেট দিয়ে গেল। এত ছোট ছোট ওমলেট গোবিন্দ জীবনে দেখেনি। য়ুকি কেমন কাঠি দুটো দিয়ে ওমলেট ধরে খাচ্ছে দেখে গোবিন্দ বুঝল কেন ওমলেট ছোট ছোট। গোবিন্দ চামচ দিয়ে কোনরকমে ম্যানেজ করল।

— ডিউরিং মাই টুর প্লিজ সার্ভ মি চিকেন ওনলি, নট বিফ, পর্ক, অর মটন এটসেট্রা।

— ওকে স্যার।

— থ্যাঙ্ক ইউ।

হায়রে, কি যে খাব প-নে-র দিন ! মনে মনে ভাবল খাদ্যরসিক পেটুক গোবিন্দ।

ঘরে ঢুকলেন টিপটপ সাজে সুন্দরী এক যুবতী। চাইনিজ পুতুলের মতো কপালের ওপর চুলগুলি সমান করে ছাঁটা এবং পিছনে কাঁধের ওপর চুল অমনই সমান করে ছাঁটা, স্কার্টের ওপর কোট, পায়ে গামবুটের মতো জুতো হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকা, টুকটুকে লাল ঠোঁট, একটু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন — নি হাও।

— মিস ঝেন, আওয়ার ক্যান্টিন ম্যানেজার — বললেন য়ুকি — কিচেন অফ দিস গেস্টহাউস ইজ অলসো আন্ডার হার কাস্টডি, এন্ড হিয়ার ইজ মিস্টার গোবিন্ডা বোস, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, আওয়ার ইন্ডিয়ান গেস্ট।

— নি হাও — মাথা ঝুঁকিয়ে বলল গোবিন্দ, ফিক করে হেসে ফেলল।

— হোয়াই আর ইউ লাফিং ? — জিজ্ঞাসা করলেন য়ুকি।

এইরে, কি হবে এবার ? অপমানিত বোধ করল নাকি ? ঘাবড়ে গেল গোবিন্দ — ইন মাই চাইল্ডহুড আই হ্যাড এ ভেরি নাইস চাইনিজ পিকচার বুক, দেয়ার ওয়াজ এ

স্টোরি অফ এ লিটল গার্ল নেমড ঝেন – কোনক্রমে বলল সে।



– দেন ? কৌতুহলি য়ুকি।

– সি ডিড নট লাইক টু ইট এনি থিং !

– সো ?

– আই থিঙ্ক সি ইজ নাউ ইয়াং এন্ড বিকামস্ এ ক্যান্টিন ম্যানেজার উইথ এনরমাস ফুড।

হো হো করে হেসে উঠল য়ুকি, ঝেন কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। য়ুকি সব বুঝিয়ে বললে হেসে লুটোপুটি, চ্যাং চুং করে কি সব বললে এবার গোবিন্দ বোকা।

– ও বলছে – ইউ আর ভেরি হিউমারাস – বললেন য়ুকি।

যাক বাবা ! ফাঁড়া কাটল ! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

হাসি থামিয়ে ঝেন কি যেন বলল। য়ুকিও কি সব বলে গেল, শেষে ইংরাজি করে গোবিন্দকে যা বোঝাল তা হচ্ছে ও জানতে এসেছে তোমার খাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, য়ুকি বলেছে কিছু সমস্যা হচ্ছে, চিকেনের ব্যবস্থা করার কথাও বলেছে, সমস্যার

সমাধান হয়ে যাবে। ঝেন বলছে চাইনিজ খাবার তার স্বাদের জন্য সারা পৃথিবী বিখ্যাত, চিন্তার কিছু নেই।

বিদায় জানিয়ে ঝেন চলে গেল।

খাওয়া শেষে য়ুকি কাগজের রুমালে আঙুল আর ঠোঁট মুছলেন, দেখাদেখি গোবিন্দও, কিন্তু মনটা খচখচ করতে লাগল, ভাবল সুযোগ বুঝে টয়লেটে গিয়ে ভাল করে মুখ হাত ধুতে হবে।

অতঃপর কাগজপত্রের ফাইল নিয়ে গোবিন্ডা বোস য়ুকির সাথে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে উপনীত হল, য়ুকির মাধ্যমে পরিচিত হল, য়ুকির মাধ্যমেই কাজ বুঝল এবং ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করল।

কাজের সময় আটটা থেকে পাঁচটা, তার আগে ব্রেকফাস্ট সকাল সাতটায়, লাঞ্চ টাইম বারোটা থেকে একটা, ডিনার টাইম সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা – বুঝিয়ে দিলেন য়ুকি। তিনি রোজ আসবেন আটটা বাজতে দশ মিনিট আগে, প্রস্থান করবেন পাঁচটা দশে। ব্রেকফাস্ট ও ডিনার তাকে একাই করতে হবে। ডিনার শেষ হলে সাড়ে সাতটার পর কুক ও বেয়ারা চলে যাবে। যদিও গেস্ট হাউসে নাইট গার্ড ও রাত-ডিউটিতে একজন বেয়ারা থাকে। শনিবার ও রবিবার ছুটি। আজ সোমবার, সামনের শনিবারের পরের শনিবার সকালে ড্রাইভার তাকে বেজিং পৌঁছে দেবে। – ওয়ার্ক সিডিউল টাইপ করা একটা কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিল য়ুকি।

চিনের সুদূর উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত এই শহরে উত্তুরে বাতাসের প্রকোপ খুব বেশি। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি সারা শরীরকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কলকাতার সবচেয়ে বেশি শীতও এমন হয়না।

সাড়ে পাঁচটায় গেস্টহাউসে ফিরল সে। য়ুকি চলে গেছে। সাড়ে ছটায় ডিনার! কি অদ্ভুত ব্যাপার! যদিও খিদে পাচ্ছে। দুপুরে ভাল করে খাওয়া হয়নি। বাথরুমে ঢুকে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে বসল, সারা দিনের কাজের খতিয়ান ডায়েরিতে লিখতে হবে। তার আগে বাড়িতে ফোন করা দরকার।

ডিনারে বসে মনখুস! কি সুন্দর পুর দেওয়া মুচমুচে পরোটা! সঙ্গে বোনলেস চিকেনের সাথে গাজর ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজের বড়বড় পাপড়ি নানান সস দিয়ে মেখে তৈরি! খাদ্যরসিক গোবিন্দর মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেল।

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে খিদেয় পেট চুঁইচুঁই। ইলেকট্রিক কম্বলের উষ্ণতায় ঘুম হয়েছিল ভালই।

ব্রেকফাস্টে এলাহি ব্যাপার, ফ্রুটজুস, নুডল, ডিমসেদ্ধ, মিল্কসেক – বোধহয় সয়ামিল্ক–ফাটাফাটি!

–গুড মর্নি–য়ুকি এসে বললেন।

–গুড মর্নি।

–হ্যাভ ইউ এনজয়েড ইয়োর ডিনার এন্ড ব্রেকফাস্ট? – কেমন একটা রহস্যময় হাসি ওনার ঠোঁটে।

–ডিলিসিয়াস!–মহানন্দে বলল গোবিন্দ–থ্যাঙ্ক ইউ।

–গিভ থ্যাঙ্কস টু ঝেন, স্পেশালি সি হ্যাজ এরেঞ্জড ফর ইউ। সি হ্যাজ গিভ ইউ এ গুড নেম–হাও চাও।

–মাই নেম?

–ইয়েস, দ্যাট মিনস 'ফানি', বলে খুব হেসে নিলেন য়ুকি–ফানি বোস।

– গোবিন্দও হাসল। হায় কপাল! এত হাজার মাইল দূরে এসে অন্য ভাষার মানুষের কাছেও সে গোবু! যাকগে, খাওয়াটাতো ভাল হচ্ছে!

বড়দিদির মতো স্নেহময়ী য়ুকি ও ঝেন এর মতো আন্তরিক ম্যানেজারের তদারকিতে রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যে ভুরিভোজ করে গোবিন্দর ট্যুর ভালই কাটল। এদেশে মেয়েরাও খুব পরিশ্রম করে। ফ্যাক্টরির টিউব সেকশনে সে দেখেছে সবটাই মেয়েরা করছে, দশ বারো ফুট লম্বা দশ সেমি ডায়মেটারের ভারি টিউবগুলো দুজন মহিলা লেদ মেশিনে লোড আনলোড করছেন, মেশিন অপারেটরও মহিলা, যথেষ্ট কুশলতায় তিনি ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং করছেন। এতদিন তার ধারণা ছিল চাইনিজ মানে ছোটখাটো চেহারার ছিপছিপে মানুষ, কিন্তু না, অঞ্চল ভেদে মানুষের চেহারা আলাদা। লম্বা চওড়া চেহারার মানুষও যথেষ্ট। যদিও চোখ সকলেরই একটু ছোট।

এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, মূল শহর এখান থেকে একটু দূরে, ইচ্ছা করলেও সন্ধ্যাবেলা বা ছুটির দিনে একটু ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। তাই একটু একঘেয়ে লাগে। বিশেষতঃ ডিনারের পর গেস্টহাউস যখন ফাঁকা হয়ে যায়, রাত্রি নিঝুম হয়ে আসে তখন বুকের মধ্যে কি যেন একটা ভার চেপে ধরে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে সে।



অবশেষে ছুটি ছুটি ছুটি! ড্রাইভারকে বারবার করে বুঝিয়ে ছাড়লেন য়ুকি। ঝেন এসে দাঁড়াল, হাতে একটা প্যাকেট, সেটা গোবিন্দর হাতে দিল। নির্বাক নিঃশব্দ ভালবাসা।

—দিস ইজ ইয়োর লাঞ্চ প্যাকেট—য়ুকি বললেন।

গাড়িতে উঠল গোবিন্দ। হাত নাড়ল ঝেন। আবহাওয়াটা কেমন করুণ হয়ে গেছে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে গোবিন্দ মুখ নামিয়ে নিল। গাড়ি গতি নিচ্ছে, একবার পিছন ফিরে তাকাতে খুব ইচ্ছা করছিল তার কিন্তু গাড়ি বাঁক নিয়ে নিল।

ঝুয়ানয়ুমেন ওয়েস্ট রোড — ড্রাইভারের সামনে আটকানো মোবাইলে রাস্তার নির্দেশ মেনে গাড়ি এসে থামল হোটেলের সামনে। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা।

মিস্টার গোবিন্ডা বোসকে তার ট্রলিব্যাগ সমেত রিসেপশন কাউন্টারে পৌঁছে রিসেপশনিস্ট মহিলাকে কত কিছু বুঝিয়ে দিলেন ড্রাইভার সাহেব, তারপর সহসা বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে নিয়ে এলেন একটি ম্যাঙ্গোজুসের বোতল, সেটা গোবিন্দর হাতে দিয়ে গভীর আন্তরিকতায় হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করলেন। নির্বাক নিঃশব্দ ভালবাসা, হাত নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটখাট পরিচ্ছন্ন হোটেল। দোতলায় রাস্তার ধারে ঘরটি ভালই। ডবল বেডরুম। পর্দা সরালে বড় কাচের জানালা ছুঁয়ে আছে অচেনা এক গাছের ডালপালা, দূরে রাস্তায় পথচারী, গাড়ি, বাস। বাথরুমে বাথটব। হাত ধুয়ে নিল, লাঞ্চ করে নিতে হবে, ঝেন এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল তার, থ্যাঙ্ক ইউ ঝেন, থ্যাঙ্ক ইউ!

হতে সময় কম। আজ বারোটা থেকে কাল বারোটা, কাল থেকে পরশু, পরশু থেকে তার পরদিন — তিন দিন, সেদিনই ফেরবার প্লেন। তিয়েনআনমেন স্কোয়ার, ফরবিডন সিটি, খুবই কাছে, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।

ঝকঝকে রোদ, কিন্তু শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মেখে বেরিয়ে পড়ল সে। হোটেলের রিসেপশন থেকে একটা কার্ড নিয়ে কার্ডের পিছনে আঁকা সংক্ষিপ্ত ম্যাপে রাস্তা বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ইংরেজি বোঝে কিন্তু উচ্চারণের ঠেলা সামলানো কঠিন! পাশপোর্টকে বলে ফ্যাসফোত!

এখানে লেফ্‌টহ্যান্ড ড্রাইভ পথ। ঝুয়ানয়ুমেন ওয়েস্ট রোড — কি বিশাল রাস্তা!

প্রথমে ফুটপাথ, তারপর সাইকেলের পথ – সেটা অতিক্রম করে আইল্যান্ড ও বাসস্টপ, গাড়ির রাস্তা – আপ, আবার আইল্যান্ড ও বাসস্টপ ডাউন রাস্তা, আবার আইল্যান্ড তারপর আবার ডাইনে সাইকেলের পথ, তারপর আবার ফুটপাথ। সব গুলিয়ে যাচ্ছে! সাবধানে রাস্তা পার হল সে। হেঁটেই যাবে ঠিক করল। এইতো সামনে ঝুইয়ামেন রোড, ডানদিকে ঘুরে সোজা রাস্তা তিয়ানআনমেন স্কোয়ার, ওপারেই ফরবিডন সিটি। জোরে পা চালাল সে।

তারপর খুলে গেল সেই স্বপ্নের রাজপুরী দ্বার! এখানে বিদেশী এবং দেশীয় সকলের জন্য প্রবেশমূল্য একই! একজন দুজন ছাড়াও অনেকে ঢুকছে দল বেঁধে। প্রায় পনের কুড়ি জনের দল। দেখে মনে হয় গ্রামের মানুষ। দলপতির হাতে লম্বা ডাণ্ডার মাথায় তাদের নিজস্ব চিহ্ন আঁকা পতাকা। দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। বেশ ভাল বুদ্ধি! যেমন ইচ্ছা ঘোরোফেরো পতাকার তলে সম্মিলিত হও।

প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল উত্তেজিত গোবিন্দ মামাকে ফোন করল – মামা ছোটবেলায় তোমার দেওয়া রূপকথার রাজ্যে আমি ঢুকতে চলেছি –

– বাংলা বলিতং? না বুঝিতং, টেলিং চাইনিজং অর ইংলিশং!

– অ! মিস্টার গোবিন্ডা বোস ইজ নাউ এনটারিং ইন দ্য ড্রিমল্যান্ড অফ হিজ চাইল্ডহুড – দ্য ফরবিডন সিটি, অ্যান্ড ফিলিং ভেরি ভেরি এক্সাইটেড!

– উইশ ইয়োর গুডলাক।

– থ্যাঙ্ক ইউ।



পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দর নগরীতে সারাদিন ঘুরেঘুরে আর ছবি তুলে কাটাল গোবিন্দ। ইম্পিরিয়াল গার্ডেনে ঘুরেঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা বেঞ্চে বসল। হঠাৎ তার মনে পড়ল মামার বলা একটা গল্পের কথা। চা এর আবিষ্কার হয়েছিল নাকি এই চিনে। ঠাণ্ডার দেশ চিন-এ চাইনিজরা গরম জল পান করে। এই বাগানে কোনো এক গাছের নীচে সম্রাট এসে বসতেন। একদিন ভৃত্য আসন প্রস্তুত করে সম্রাটের পান করার জন্য গরম জলের পাত্র এনে রেখেছে, সহসা দেখল গরম জলে খসে পড়ে আছে দুটি পাতা। তাড়াতাড়ি তুলে ফেলে দিল সে। সম্রাট এলেন, বসলেন আর গরম জল পান করলেন। জল পান করে তিনি কেমন একটা স্বাদ পেলেন, আর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ভৃত্যের কাছে জানতে চাইলেন সে জলে কি মিশিয়েছে?

ভীত ভৃত্য অস্বীকার করতে থাকলে তিনি রেগে গেলেন ও না বললে কোতল করবেন বললেন। ভৃত্য বাধ্য হয়ে বলল – কিছু মেশাইনি তবে এই গাছের দুটি শুকনো পাতা জলে পড়েছিল তুলে ফেলে দিয়েছি।

সম্রাট হুকুম দিলেন রোজ সকালে তার পানের জন্য গরম জলে এই গাছের পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। সেই গাছটিই ছিল চা গাছ। এভাবেই চা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গোবিন্দ আবার মামাকে ফোন করল – গোবিন্ডা বোস স্পিকিং, আই অ্যাম দ্য এমপারার সিটিং ইন দ্য ইমপিরিয়াল গার্ডেন অফ ফরবিডন সিটি কলিং ইউ ...



ঘুরে বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। ঝুয়ানয়ুমেন রোডের পরিচ্ছন্ন চওড়া ফুটপাথ, মাঝে মাঝে বসার বেঞ্চ, তারপর বিশাল সব গাছেরা দাঁড়িয়ে, গোবিন্দ একটা বেঞ্চে বসল। বাড়ি ফেরা ব্যস্ত মানুষের দল। সহসা গোবিন্দর মনে কেমন এক

বিষাদ শূন্যতা, মনে হলো সে বড় একা। এই বিশাল শহরে কেউ তাকে চেনেনা। এখানে কোনো বাড়িতে তার অপেক্ষায় কেউ নেই, সে কড়া নাড়লে সাগ্রহে দরজা খুলে দেবে। বাড়ির জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। উঠে পড়ল সে।

এখন ডিনার টাইম, এই হোটেলে খাবার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সামনেই ভাল ভাল রেস্টুরেন্ট আছে, একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল সে, একটা ফাঁকা টেবিলে বসল। একটি মেয়ে এসে ছবিওয়ালা মেনুকার্ড দিয়ে কি সব বলল, গোবিন্দ কিছুই বুঝল না, মেনুকার্ডে ছবি দেখে ও চিনা লেখা দেখে কিছুই বুঝল না, বলল চিকেন এন্ড রাইস। মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে গোবিন্দ মেনুকার্ড দেখিয়ে বলল ইংলিশ ইংলিশ।

কিছু না বলে মেয়েটি চলে গেল। গোবিন্দ বুদ্ধু হয়ে এদিক ওদিকর দেখতে লাগল। বেশ ভীড়। মেয়েরা ব্যস্ত খাবার সার্ভ করতে, খদ্দেররা ব্যস্ত খেতে। সবাই ব্যস্ত কিচিরমিচির করে কথা বলতে। ইতিমধ্যে মেয়েটি ফিরে এল, সঙ্গে আরেকজন, সে বলল – হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট স্যার?

– গিভ মি রাইস এন্ড চিকেন কারি প্লিজ।

– ওকে স্যার। দুজনে সখীর মতো কিচিরমিচির করে হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল।

কাঠি দিয়ে ধরে খায় তাই এরা বোনলেস চিকেন তৈরি করে, তাই এলো, একবাটি ভাত ও বোনলেস চিকেন কারি। সাথে একটা ছোট ওমলেট। দুটি কাঠিও দিয়ে গেল। দিয়ে চলে যায় দেখে অসহায় গোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠল – গিভ মি এ স্পুন প্লিজ –

– মেয়েটি ফিরল, গোবিন্দ কাঠি দুটি তার দিকে এগিয়ে ধরে বলল – টেক ইট, গিভ মি এ স্পুন প্লিজ।

স্টিলের চামচ নয়, এলো সুপ খাবার চিনামাটির চামচ। খাওয়া শেষে বাইরে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবল এখন কি করা যায়! কার্ড বার করে ম্যাপ দেখল – সামনেই চ্যাংচুংজিয়ে সাবওয়ে স্টেশন – টিউব রেলকে এরা দেখি বলে সাবওয়ে। একটু মাটির নীচে ছোটাছুটি করে এলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমন কাজ! নেমে পড়ল, ম্যাপ দেখাচ্ছে তিয়েনআনমেন স্কোয়ার তিনটে স্টেশন – টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। মোটামুটি কলকাতার মতই স্টেশন, তবে আরো বড় আর ঝলমলে। মিনিটের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল, কলকাতার মতোই, ভীড় আছে তবে ঠাসাঠাসি নয়।

আলোঝলমল তিয়ানআনমেন স্কোয়ারের কাছে একটু ঘোরাঘুরি করে আবার ট্রেনেই ফিরে এলো সে, হোটেলে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

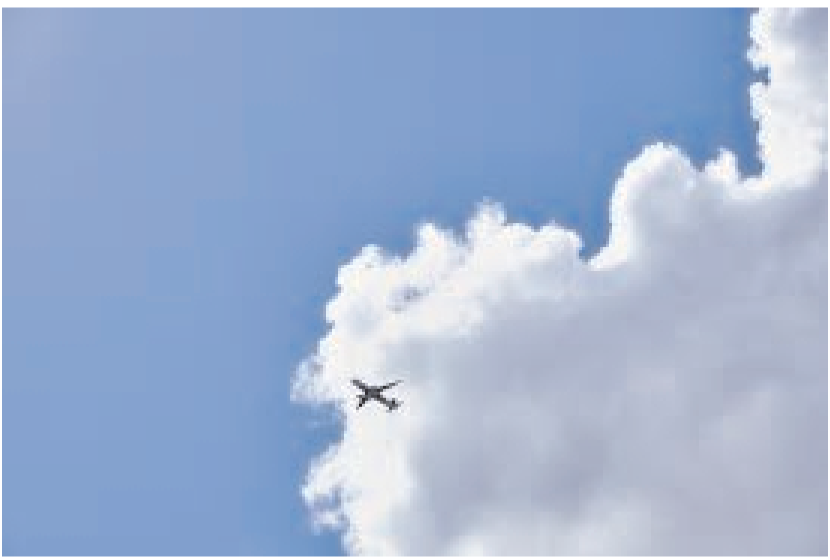
পরের দিন কন্ডাকটেড ট্যুরে গ্রেট ওয়াল। কি উঁচু উঁচু সিঁড়ি! উঠতে দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়! সাধারণ চিনারা তো বেঁটে, তাহলে উঠত কি করে? নাকি সেনাবাহিনীতে দীর্ঘাঙ্গ প্রজাতির মানুষদেরই নেওয়া হতো? কি ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস বইছে! যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে দেওয়াল চলে গেছে!



চোখ বুজে গোবিন্দ অনুভব করতে চাইল কৈশোরে যখন স্বপ্নে সে ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে ছুটেছে!



হাতে আর একদিন। মহান নেতা মাও সে তুং এর মাইসেলিয়াম, এছাড়া এই বিশাল শহর – এই সুন্দর শহরে কত কিছু দেখার আছে! থাক সেসব যথাস্থানে! আমি ফিরে যাব গোলবাগানের সেই গলিতে, সেখানেই আমার সুখ শান্তি আনন্দ।





তৃতীয় পর্ব

হিরণ্যের হরি হরণ



মায়ের ঠাকুর পুজোর বাতাসা দিয়ে একগ্লাস জল খেয়ে গোবিন্দ কোট প্যান্ট টাই খুলে পাজামা পাঞ্জাবী পরে নিজের বিছানায় লম্বমান হয়ে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কোন ভোর থেকে ছুটোছুটি শুরু হয়েছে! এই এয়ারপোর্ট, ওই এয়ারপোর্ট, সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার জার্নি!

ঘুম ভাঙল দুপুর বেলা মামার ডাকে – গোবিন্ডা বাবু উঠুন, গলদা চিংড়ির মালাইকারি দিয়ে লাঞ্চ করুন। সাথে কাতলা মাছের পেটির কালিয়াও আছে!



যাই হোক, এতদিন পর গোবিন্দবাবু জীবনে যা হোক একটু প্রতিষ্ঠিত হয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেয়েছেন, এখন তিনি বুঝতে পারেন পাড়ার অনেকেই তাঁকে সমীহ করে কথা বলে। ফেসবুকে তিনি ইংরাজিতে – গোবিন্ডা বোস, এম টেক, বয়স আঠাশ, আনম্যারেড, কোট টাই পরা ছবিটা দেখে স্মার্ট এবং সুন্দর বলতেই হবে।

মাস খানেক পরের কথা। আজ মামাবাবুর জন্মদিন। আজ তাঁর বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হলো। আজ রবিবার। সকাল বেলা মামাবাবুর জন্য একটা রজনীগন্ধার গোড়েমালা কিনে এনেছে গোবিন্দ। সুবর্ণ জয়ন্তী বলে কথা! বাইরের ঘরের সোফায় বসে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত মামাবাবু। দিদি কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে প্লেটে করে মিষ্টি সাজিয়ে দিয়েছেন টি-টেবিলে, গোবিন্দ মালাটি নিয়ে পরাতে যাচ্ছে এমন সময় দুয়ারে এসে দাঁড়াল চার জন কিশোর ও এক যুবতী।

এ বাড়িতে বিশেষ কেউ আসেটাসে না। কে ই বা আসবেন, আর কি বা দরকারে আসবেন! বাইরের ঘরটি মামাবাবুর স্টাডি রুম, বইপত্রের আলমারি, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে এলোমেলো ঠাসা, তার মাঝে সোফাসেট, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি।

মামাবাবু বসে, গোবিন্দ মালা হাতে জবুথবু দাঁড়িয়ে, মেয়েটি ইতস্ততঃ করে বলল –আসতে পারি?

— আসুন — মামাবাবু বললেন।

— আমরা বোধহয় আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম — সঙ্কুচিত ভাবে বলল সে।

এমন সময় দুহাতে দুকাপ চা নিয়ে ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মৃণ্ময়ী, মানে — গোবিন্দর মা, মামাবাবুর দিদি।

— কে রে গোবু? — উনিও অবাক।

— আমরা ওনার কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে — মেয়েটি বলল।

— ও! তা বসো বসো, আজ আমার ভায়ের জন্মদিন, বললেন মৃণ্ময়ী, — তা তোমরা যে দরকারেই আসোনা কেন এখন তো একটু বসতেই হবে।

— সকলে হাসি হাসি মুখে ইতস্ততঃ বসল।

— দে মামাকে মালাটা পরিয়ে দে — গোবিন্দকে বলল মৃণ্ময়ী।

গোবিন্দ মালা পরিয়ে দিল। মেয়েটি হাততালি দিতে দিতে সকলকে হাতিতালি দিতে ইশারা করল, ছেলেরা সবাই মৃদু হাততালি দিতে থাকলে গোবিন্দও হাত মেলাল।

— ভাল দিনেই আমরা এলাম, মেয়েটি বলল।

— হ্যাঁ, মৃণ্ময়ী বললেন, — তোমাদের সকলকে একটু মিষ্টি দিই।

একটি বড় প্লেটে একসাথে কতগুলি সন্দেশ এনে সকলকে দিলেন, জল দিলেন —বললেন খাও সবাই। সকলে সন্দেশ তুলে নিল, মেয়েটি সবার শেষে নিয়ে একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই খেলো, জল খেলো।

— আমার ভায়েদের একটা ক্লাব আছে এ পাড়ায়, রবীন্দ্র সংঘ — কালী বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি, — ওরা রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান করবে, নিজেদের ক্লাবের হলঘরেই করবে, ওখানে আপনাকে প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

কালীবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন — সে কি ব্যাপার, আমি তো কখনো এসব করিনি, কি বলতে হবে, কি করতে হবে — তাছাড়া পাড়ায় কত বয়স্ক মানুষ রয়েছেন।

— তা আছেন — মেয়েটি বলল — কিন্তু আপনি কবি মানুষ, পত্রিকার সম্পাদক, ছড়াকার হিসাবে আপনার যথেষ্ট নাম আছে, আপনার মর্যাদা আলাদা।

— কিন্তু আমি বক্তৃতা মোটেই দিতে পারিনা।

— কি যে বলেন স্যার! আপনি সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের মানুষ, বক্তৃতা নয়,

আপনি রবীন্দ্রনাথের কথা বলবেন।

— না করছিস কেন কালী — মৃণ্ময়ী বললেন — সত্যি তো, তুই মান্যি করার মতো লোক নয়? সেদিন রাস্তায় ওনার বন্ধু সুধাময় বাবুর সঙ্গে দেখা হলো, বললেন, আপনার ভাই বেশ ভালই লিখছে, নাতির কাছে একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম।

— তবে! ব্যাস, ব্যাস! আপনি অবশ্যই যাচ্ছেন — মহা উৎসাহ নিয়ে বলল মেয়েটি।

— গোবিন্দ এতক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কথপোকথন শুনছিল, সহসা মেয়েটি তার দিকে তাকাল, গোবিন্দ একটু থতমত খেয়ে গেল, আর মেয়েটি সেই মুহূর্তে মিষ্টি একটু হাসি দিয়ে ঘাড় কাত করে বলল — আপনিও যাবেন কিন্তু!

মুখচোরা গোবিন্দর কাছে এটা একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! অসহায় ভাবে সে একবার মামার দিকে চাইল তারপর ঢোক গিলে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল — আমি গিয়ে কি করব?

— অসুবিধার কি আছে — মেয়েটি বলল আপনি বিশেষ অতিথিদের আসনে বসে শুনবেন। তাছাড়া ফেসবুকে দেখলাম আপনি সম্প্রতি চিন ভ্রমণ করে এসেছেন, কত ছবি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ চিন সম্পর্কে যে উচ্চপ্রশংসা ও ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন সেটা সংক্ষেপে দুএক লাইন বলতে পারেন।

— আমি তো কিছুই জানিনা।

— সে হয়ে যাবে।

— কি করে?

— মামাবাবু একটু হেল্প করে দেবেন — পুনরায় একটু হেসে ঘাড় কাত করে বলল সে।

— আমাকে আবার কেন? — গোবিন্দবাবু একেবারে কাবু।

— যাবে যাবে, ও গোবু অত করে বলছে যখন, ওর একটা মান সম্মান নেই? তোমার নাম কি মা?

— হিরণ্যা সেন, সবাই আমাকে হিরা বলে ডাকে।

— বাঃ, বেশ নাম — বললেন মা, ওরা দুজনেই যাবে।

— বেশ নামটি, মনে মনে বলল গোবিন্দ।

— কি ভালই না হল! দু দুজন গুণী মানুষকে আমরা পেয়ে গেলাম — বলল হিরণ্যা,

ধন্যবাদ স্যার, জোড়হাত করে বলল মেয়েটি, – এই ভায়েরা, স্যারেদের প্রণাম করো।

সকলে হুড়োহুড়ি করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

জীবনে এই প্রথম এমন সাম্মানিক প্রস্তাব সহ এতগুলি প্রণাম পাওয়া, একটু ভাল লাগে বইকি গোবিন্দর, এবং এর জন্য উদ্যোগী এই মেয়েটি, সকৃতজ্ঞ চিত্তে হাসিহাসি মুখে সে হাতজোড় করে মেয়েটিকে নমস্কার জানাল। দেখে একগাল হাসলেন মৃণ্ময়ী।

ওরা চলে গেছে। মামাবাবু একটি মাত্র সন্দেশ খেয়ে আলাপনে ব্যস্ত ছিলেন, এখন বাকি মিষ্টিগুলি সদব্যবহার করতে লেগেছেন। মৃণ্ময়ী ফিরে গেছেন রান্নাঘরে। নিস্তব্ধ ঘরে পাখার মৃদু শব্দ। বাতাসে মৃদু সুগন্ধ ভাসিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েটি। বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে আনমনা গোবিন্দ বুক ভরে সুগন্ধ নিল। মামাবাবু আড়চোখে সেদিকে তাকালেন।

পরের রবিবার সকালে মেয়েটি হাজির, হাতে একগোছা কার্ড। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল – আসতে পারি ?

– গোবিন্দ তখন খবরের কাগজ পড়ছে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল – আসুন আসুন।

– আপনাকে কার্ডটা দিতে এলাম – একটা কার্ড খাম থেকে বার করে এগিয়ে দিল মেয়েটি।

– ছাপার অক্ষরে লেখা – প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবেন শ্রদ্ধেয় কবি শ্রী কালীপদ ঘোষ মহাশয় – ইত্যাদি ইত্যাদি।

– বসুন – বলল গোবিন্দ – মামাবাবু বাজার গেছেন, এখনি এসে পড়বেন।

– কে রে গোবু, কার সঙ্গে কথা বলছিস – বলতে বলতে মা দরজায় – ওমা, তুমি ?

(ওই ! আবার গোবু ! আর পারা যায়না !) মনে মনে হতাশ গোবিন্দ,

– এই কার্ডটা দিতে এলাম।

– তা দাঁড়িয়ে কেন ? বসো, পড়াশোনা কর বুঝি ?

– হ্যাঁ, বাংলা নিয়ে এম এ পড়ছি !

—বাঃ, বেশ বেশ, একটু বসো, আমিএকটু চায়ের.....

—না না, —প্রবল আপত্তি জানাল সে —আমার জন্য আপনি —না না।

— শুধু তোমার জন্য নয়, আমরা এখনো চা খাইনি, আজ তো রবিবার, এই তো সবে নটা বাজে, কালী বাজার গেছে, এবার এসে পড়বে, এলে একসঙ্গে চা খাওয়া হবে, তোমরা বসে গল্প কর, আমি এদিকে ব্যবস্থা করি।

মৃদু সুগন্ধে ভরে আছে ঘরের বাতাস। এ গন্ধ কি ওর চুলে নাকি শাড়িতে ? যেন চুরি করে শ্বাস নিল গোবিন্দ, আড় চোখে দেখল। সেদিন একটা জমকালো চুড়িদার পরে এসেছিল, কিন্তু তেমন কিছু আকর্ষণীয় লাগছিল না গোবিন্দর, কিন্তু আজ হালকা অথচ সুন্দর সাজ। পরেছে মাখন রঙের চওড়া পাড় শাড়ি, তাতে সারিসারি পোড়ামাটির পুতুল। শাড়ির জমিতেও বড়বড় পোড়ামাটির পুতুল। কানের লতিতে ঝুলছে ছোট ছোট দুটি অমনই পুতুল। কোলের ওপর রাখা কার্ডগুলির দিকে তাকিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সে, নাকি পুতুলগুলি নিয়ে খেলা করছিল! দু হাতে দুই পোড়ামাটির বালা। জড়ানো চুলের এলো খোঁপায় একটা পিন গোঁজা, তাতেও একটা পুতুল ! বড় শান্ত আর সুন্দর ! আনমনে দেখতে দেখতে নামে গবা কিন্তু অতিশয় ধীমান গোবিন্দর সহসা মনে হলো – আমি দেখব বলেই ও এমন সুন্দর করে সেজেছে, আর এখন আমাকে দেখার সুযোগ দিয়ে কার্ড দেখার ভান করছে !

অতি ধীরে চোখ তুলল হিরণ্যা, যেন গোবিন্দকে সময় দিল চোখ সরিয়ে নেবার। কিন্তু দৃষ্টি না সরানোয় চোখাচোখি।

— ফেসবুকে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাব ? —মৃদু গলায় বলল হিরা।

—আমি পাঠাব ভাবছিলাম, খুলেও কি ভাববেন ভেবে ...

— ভেবেছেন ! এতো আমার সৌভাগ্য !

— কি যে বলেন ! আপনি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন, সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ, অনেক উচ্চস্তরের বিষয়, যারা চর্চা করেন তাঁদের সম্মান আলাদা।

— মোটেই না, বরং মেধাবী ছাত্ররাই বিজ্ঞান পড়তে যায়।

মামাবাবু দুহাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলেন, কথাটা চাপা পড়ে গেল।

—কি ব্যাপার ? —মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে এলাম।

—তাই বুঝি ? আচ্ছা আসছি, এগুলো রেখে আসি।

– আমার খুব খারাপ লাগছে, মাসীমা রান্না করছেন আর আমি খাবো – আমি কি একটু সাহায্য করতে পারিনা ?

– সে আমি কি বলব !

– মামাবাবু এসে বসলেন, মৃণ্ময়ী একটি ট্রেতে কিছু খাবার নিয়ে ঢুকলেন, হিরণ্যা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে টেবিলে রাখল, তারপর খাবারগুলি সযত্নে নামিয়ে রাখল এবং ট্রেটা নিয়ে বলল – আমি না হয় আপনাকে একটু সাহায্য করি।

– তা বেশত, এসো তাহলে।

এরপর আলুভাজা বেগুণভাজা সহযোগে পরটা, তারপর চা – আসরটা বেশ জমে উঠল।

– তুমি তো এ পাড়াতেই থাক, কোন বাড়িটা তোমাদের ? – মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

– ওইতো, রবীন্দ্র সংঘের ডানদিকের বাড়িটা আমাদের। আমরা এপাড়ায় নতুন এসেছি, মাস ছয়েক আগে বাড়িটা কেনা হয়েছে।

– ও, তাই বল ! আমি ভাবছিলাম পাড়ার মেয়ে অথচ চিনিনা !

কেমন একটা মিষ্টি আবহাওয়া তৈরি করে দিয়ে মেয়েটি চলে গেছে। তার মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আছে ঘরে। এখন ঘরে একা বসে গোবিন্দ। এ সুবাসের সীমারেখা কি ওই দরজা পর্যন্ত – ভাবছিল গোবিন্দ, খোলা খবরের কাগজ হাতে, কিন্তু কিছুই পড়ছিল না। সহসা মনে হল ফেসবুকের কথা, তাড়াতাড়ি উঠে ছুটল নিজের ঘরে স্মার্টফোনটা আঁকড়ে ধরল পরম বন্ধুর মতো ! খাটের বাজুতে বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল, তারপর কাঁপা কাঁপা আঙুলে নামটা টাইপ করতে খুলে গেল রূপকথার রাজত্ব ! অপলক চোখে হিরণ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন আর কোন বাধা নেই। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিল। প্রায় সাথে সাথেই সাড়া !

বিশেষ অতিথির ভাষণ নিয়ে গোবিন্দ বেশ ভাবিত ছিল। রবীন্দ্র জীবনী একটা বই কিনে এনে লিখতে বসে উল্টেপাল্টে কিছুই খুঁজে পেল না। বিশেষতঃ বাংলা অনার্সের ছাত্রী হিরণ্যা ! শ্রোতা তো ওই একজনাই ! বিশেষতঃ তিনি আবার বলে রেখেছেন তার চিন ভ্রমণের কথা কিছু বলতে আর তার সাথে জড়িয়ে চিন সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তা বলতে। মঞ্চে তার আলফাল বক্তব্য শুনে মিচকি হাসবে। কদিন ধরে টেবিলে খুলে রাখা প্যাড সাদাই থেকে গেল। আড়াল থেকে দেখে দেখে মুচকি হেসে মামাবাবু বললেন – কি থিসিস লিখছ গোবুবাবু? সাদা পাতা তো সাদাই পড়ে থাকছে দেখছি! তারপর সেদিন অফিস থেকে ফিরে দেখল সাদা পাতায় মামার লিখে রাখা বক্তৃতা –

রবি যেমন আলোর কিরণে আমাদের আলোকিত করে ....

রোজ অফিস থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে গোবিন্দ রবীন্দ্র কথা মুখস্ত করে। মুখস্ত হয়েই গেছে, এখন চলছে অভিব্যক্তির প্রকাশ। কিন্তু তাতে হল ছন্দপতন। সেদিন অফিস থেকে ফিরে গোবিন্দ জলখাবার খেল না, এমনকি এক কাপ চা পর্যন্ত নয়! চুপচাপ শুয়ে রইল।

– কি হল রে? – মা জিজ্ঞাসা করলেন।

– কিছুনা, এমনি, ভাল লাগছে না।

বুকের মধ্যে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ গুরুতর! হয়েছে কি অফিস থেকে ফেরার সময় যখন মেন রাস্তা থেকে পাড়ায় ঢুকেছে তখন গোবিন্দ দেখল দূর থেকে হিরণ্যা আসছে, পাশে এক সুদর্শন যুবক। দুজনে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তায় নিমগ্ন। দেখে গোবিন্দর বুকটা ধ্বক করে উঠল। আরেকটু কাছে আসতে বুকের ভেতর দুবার ধ্বক ধ্বক। আরেকটু কাছে আসতে বুকের ভেতর ধ্বক ধ্বক ধ্বক – সে আর থামতে চায় না। গোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার পাশে একটা গুমটি দোকানে গিয়ে দাঁড়াল – একটা বিস্কুটের প্যাকেট, আর একটা ওই যে কি বলে ...

ওরা পিছন দিয়ে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারল সে, কথা নেই কিন্তু সেই সুগন্ধ! চার পাঁচ মিনিট এটা সেটা করে সময় কাটাল সে, তারপর চলল। কি কড়া গন্ধের পারফিউম মাখে মেয়েটা – ভাবল, নাক ঘসে মুখ কোঁচকাল। পিছন ফিরে তাকানোর জন্য কষ্ট হলেও মন চাইছিল কিন্তু অনেক কষ্টেই নিজেকে সংযত করল।

তারপর, এখন সে শুয়ে আছে, কোন ভাবনা নয়, শুধুই এক বিষণ্ণতা আর শুষ্ক ভাব! আজ আর বক্তৃতা মুখস্ত করল না, সব উৎসাহ নিভে গেছে। বরং তার মনে হল তাকে জব্দ করার জন্যই হিরণ্যা বক্তৃতায় চিন প্রসঙ্গ জড়িয়ে দিয়েছে, যাতে সে উপহাসস্পদ হয়। কিন্তু মামাবাবু তাকে উদ্ধার করেছেন, মোক্ষম বক্তৃতাটি দিয়ে সে মুখের মতো জবাব দেবে।

হিরণ্যা বলে গিয়েছিল অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় ক্লাবের ছেলেরা তাদের নিয়ে যেতে আসবে। সেইমত দুজন কিশোর তাদের নিতে এল। তার মধ্যে একটা সম্ভবতঃ হিরণ্যার ভাই, সেদিনও এসেছিল। মুখটা অমনই সুন্দর, কিন্তু গোবিন্দর মনে কোনরূপ স্নেহের উদ্রেক তো হলোই না বরং কেমন বিরূপ মনোভাব।

শ্রীনিকেতনের কাজকরা পাঞ্জাবী আর পাজামা পরেছিল গোবিন্দ। পোশাক নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক ভেবেচিন্তে সে এটা কিনেছে। শোরুমের বিক্রেতা মেয়েটির ওপরেই নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিল সে, বলেছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে তার উপস্থিতির কথা। অনেক খুঁজে খুঁজে এটা দিয়েছেন তিনি – এটা আপনাকে খুব ভাল মানাবে স্যার, – বলেছিলেন।

মামাবাবু তাঁর চিরাচরিত সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরেছেন।

ক্লাবের হলঘরটি ভালই। প্রায় শ'দেড়েক মানুষ। অনেক কচিকাঁচা। কারো নাচের সাজ, কারো গানের, কারো বা নাটকের। হিরণ্যা তার মাঝে উজ্জ্বল, কলকাকলিত মুখরিত! মঞ্চের সামনে বসে এসব দেখতে দেখতে গোবিন্দর মনটা হু হু করছিল। আজ তার মন অনেক অনেক কথা বলছে। বলছে বেশ তো ছিলাম আমি আপন গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, কেন তুমি আমাকে এমন করে উচ্ছসিত করে আবার নিভিয়ে দিলে! তার মনে হচ্ছিল এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু না, সব যন্ত্রণা বুকে চেপে সে তার কাজ করে যাবে, তবে গাম্ভীর্য বজায় রেখে। একটুও হাসি নয়, সামান্য উচ্ছাসও নয়। তার একপাশে বসা মামাবাবু, অন্য পাশে একজন বয়স্ক মানুষ – ক্লাবের সভাপতি, তাঁদের মতোই গম্ভীর মুখে বসে রইল সে। মামাবাবু গোবিন্দর শুকনো মুখ দেখে পিঠে হাত দিয়ে তাকে অভয় দিলেন। তিনি তো জানেন না শুকনো মুখের কারণ!

ইতিমধ্যে হিরণ্যা তার কাছে এসে নীচু হয়ে ফিসফিস করে বলল – চিন প্রসঙ্গে বলতে আপনার অসুবিধা নেই তো?

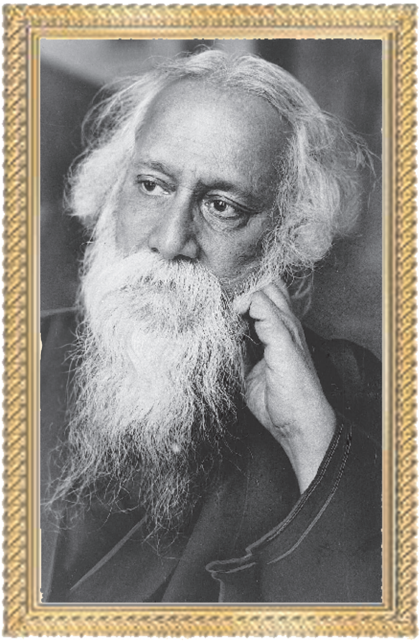
– না – গম্ভীর ভাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সে।

প্রধান অতিথির পরিচয় দিতে গিয়ে হিরণ্যা বলল – শ্রদ্ধেয় কবি ও ছড়াকার কালীপদ ঘোষ মহাশয় আমাদের পাড়ার গর্ব! আমরা তাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়ে গর্বিত।

মামাবাবু সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করলেন এভাবে – ভবিষ্যত প্রজন্মের এই সব শিশু কিশোরদের মনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সঞ্চারিত করে দেওয়ার বড়দের এই যে উদ্যোগ এ যে কতবড় কাজ! যাঁরা এই উদ্যোগ নিয়ে এমন

সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আমি মনেপ্রাণে তাঁদের সাধুবাদ জানাই। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য আমাদের গর্ব, সারা পৃথিবীতে বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এখন তাঁর উদ্দেশে রচিত আমার একটি ছড়া পাঠ করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
আমার জীবন হয় যে মধুর
তোমার গানে
আমার দুঃখ আমার ক্লান্তি
যায় মুছে, দেয় গভীর শান্তি
আমার প্রাণে।
তোমার গল্প, কাব্যগাথা
সযত্নে যে আছে রাখা
আলমারিতে
নানা কাজে বেলা যে যায়
পড়ার কাজে পারিনা হায়
সময় দিতে।
কিন্তু তোমার গানের পাটে
যায়না বাঁধা দুই মলাটে
মুক্ত স্বাধীন
ডানা মেলে বেড়ায় উড়ে
আকাশ বাতাস মুখর করে
বন্ধনহীন।
শুনে শুনে আপন মনে
হৃদমাঝারে সংগোপনে
সাজিয়ে রাখি
তোমার গানে তোমার সুরে
আমার জীবন ধন্য করে
বেঁচে থাকি।



উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ছোটদের ভালবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

প্রচুর হাততালিতে হলঘর মুখরিত।

এবার গোবিন্দর পালা।

হিরণ্যা – এবার আমি মাননীয় বিশেষ অতিথি শ্রী গোবিন্দ বসু মহাশয়কে মঞ্চে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। বয়সে নবীন কিন্তু জ্ঞানী মানুষ, তিনিও আমাদের পাড়ার গর্ব। সম্প্রতি তিনি কর্মসূত্রে চিন ঘুরে এলেন, তাঁর বক্তব্যে চিন সম্পর্কে দুএকটি কথাও শোনার ইচ্ছা জানাই।

– বাঃ ! ভারি সুন্দর করে নামটা বলল তো – ভাবল গোবিন্দ, কিন্তু শুকনো মুখে গম্ভীরভাবে মঞ্চে উঠল সে, ভাবল – তুমি আমাকে অপদস্ত করবে ভাবছ, কিন্তু পারবে না।

যথারীতি পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করল একটি ছোট মেয়ে, তারপর –

রবি যেমন আলোর কিরণে আমাদের আলোকিত করে, রবি যেমন আমাদের জীবন দাতা, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে ব্যপ্ত হয়ে আছেন তেমনই। রবীন্দ্র জীবনী নিয়ে অনেক জ্ঞানী মানুষ অনেক বই লিখেছেন। আমার পক্ষে সেসব কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমি তাই অন্য কিছু বলব। ১৯১৬ সালে হংকং এ রবীন্দ্রনাথ চিনা শ্রমিকের কাজ করার শৃঙ্খলা ও উদ্যম দেখে অভিভুত হয়েছিলেন, বলেছিলেন –

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুন্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা দেশজুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এই এতবড় একটা শক্তি যখন আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হব, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগ সাধন হবে। – কতকাল আগে করা কবিগুরুর ভবিষ্যৎবাণী আজ সত্য। সম্প্রতি কর্মসূত্রে চিন ভ্রমণকালে আমি বরাবর সেটা অনুভব করতে পেরেছি। অথচ তখন চিনের প্রায় কিছুই ছিল না। ১৯২৭ সালে দ্বিতীয়বার চিন ভ্রমণের সময় সিঙ্গাপুরে তাঁর সাথে দেখা হয় উজ্জ্বল সপ্রতিভ এক যুবকের – নাম তান-য়ুন শান। বিশ্বকবির ইচ্ছে পৃথিবীর বহু ভাষা-সংস্কৃতির মিলনায়তন হয়ে উঠবে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণকে আশীর্ব্বাদ ভেবে তান-য়ুন শান ১৯২৮ সালে এলেন শান্তিনিকেতনে, যোগ দিলেন শিক্ষক হিসেবে। তারপর শান্তিনিকেতনে তান এর

জীবন এক ইতিহাস। সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও নমস্কার, ছোটদের জানাই ভালবাসা।

সবাই হাততালি দিচ্ছেন, মঞ্চের একধারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাততালি দিচ্ছে হিরণ্যা, এক পলক তাকিয়ে চোখে চোখ – সে চোখ সরিয়ে নিল, একটুও হাসল না। না, আর সে ভুলেও ভুল করবে না। দৃঢ় পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল সে এবং কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে এল, দ্রুত পায়ে ফিরে এল বাড়ি, ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

মা – কি হল গোবু ?

গোবু – মাথা ধরেছে।

মামাবাবু ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে, গোবুর ঘরে উঁকি দিয়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করল – কি হল দিদি ?

– জানিনা বাপু, বলল তো মাথা ধরেছে।

– এ কি ব্যবহার ? – মামাবাবু বেশ রূঢ় গলায় চেঁচিয়ে বললেন – কত মর্যাদা দিয়ে মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল, কত সম্মান দিল, অথচ কাউকে কিছু না বলে এভাবে চলে আসা এ তো তাদের অপমান করা। বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছে উনি কোথায় গেলেন ? উনি কোথায় গেলেন ? আমি কিছু বলতে পারছি না। বেচারীর মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেল। অতিথি চারজনকে পাশেই ওদের বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা করেছে, সারাক্ষণ শুকনো মুখে চুপচাপ পরিবেশন করল। আমার এত খারাপ লাগছিল খেতে ! অমন হাসিখুশি মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেল।

– সে কি ? কি হয়েছে ? – মা বললেন।

– বললাম তো মাথা ধরেছে – গোবিন্দ।

– সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয় যে এভাবে চলে আসতে হবে – বেশ কঠিন গলায় বললেন মৃণ্ময়ী, – এ তো দস্তুর মতো অপমান করা।

– আনন্দ করে খাওয়াবে মনে করেছিল মনে হয় – মামাবাবু বললেন – কত রকমের আয়োজন করেছে ! আমি বারবার ক্ষমা চাইলুম, দুঃখ প্রকাশ করলুম, কিন্তু ও মানল না, বারবার বলতে লাগল – না না, নিশ্চয় আমাদের কিছু দোষ ত্রুটি হয়েছে।

– ছিঃ ছিঃ ! বাড়ি বয়ে এসে সম্মান জানিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে তো অহঙ্কার হয়েছে। অযোগ্য ! – মৃণ্ময়ী গজগজ করতে লাগলেন – এখন ওঠো, খেয়ে নাও, আর কি হবে।

—আমাকে অনেক খাইয়েছে দিদি, আর কিছু খেতে পারবোনা।

কিন্তু গোবিন্দর মন কিছুতেই শান্ত হল না।

হিরণ্যার ভাবনা ....

একটা বাজল। রাত্রি কি নিঝুম! নিস্তব্ধ চরাচর! ঘুম নেই। কি যে হলো! বেশ চলছিল সব, যেমন যেমন ইচ্ছা করছিলাম তেমনই, বরং তার চেয়ে বেশিই কাছাকাছি আসা। এত অল্পদিনে এতটা এগিয়ে যাব ভাবতেই পারিনি! কিন্তু কি যে হলো।

প্রথম যেদিন এপাড়ায় এলাম আর ট্যাক্সিতে বসে জানলা দিয়ে ওকে দেখলাম – ওর বাড়ির দরজার সামনে, স্যুট টাই পরা, ট্যাক্সি থেকে নেমেছ, কি স্মার্ট! কি সাবলীল ভঙ্গি! কি জানি কি হলো, বুকের মধ্যে কেমন এক উচ্ছলতা! মন বলল ওকে আমার চাই। বাবার বন্ধু বঙ্কুবাবু এ পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা, ওনার যোগাযোগেই এ পাড়ায় আমাদের বাড়ি কেনা, উনি একদিন আমাদের বাড়িতে চায়ের আসরে বসে বাসিন্দাদের পরিচয় জানাচ্ছিলেন, একদম বাড়ি ধরে ধরে। ওই বাড়ির কথায় বললেন – ও বাড়ির এক বিশেষ মানুষ কালীপদ বাবু, লেখেন টেখেন, বেশ নাম আছে, বয়স হয়েছে, ভারি ভাল মানুষ, ওনার ভাগনা গোবিন্দ – খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার,সম্প্রতি চিন ঘুরে এল।

শুনে আমি হেসে ফেললাম।

—কি হল হাসছিস কেন? —বাবা বললেন।

—কিছু না —হাসি বন্ধ করে বললাম আমি।

—বুঝেছি —বললেন বঙ্কুবাবু — গোবিন্দ নাম শুনে হেসেছে, তবু তো ডাক নামটা শোনেনি —গবা , গোবু —এবার আমি আরো হেসে ফেললাম।

—এ কি হিরা? —বাবা ধমক দিলেন।

—সরি বাবা —কাচুমাচু মুখ করে বললাম আমি।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে —সবাই হাসে, আবার শ্রদ্ধাও করে।

শুনে আমি আত্মহারা, এবার সত্যিই ভালবেসে ফেললাম, তারপর নির্জনে মনে মনে গোবু বলে আদরও করে ফেললাম।

তারপর কিশোর সংঘে জড়িয়ে পড়া, আর আমি তো ছোট থেকেই এসব অনুষ্ঠান ভালবাসি। মাথায় নানা প্ল্যান ঘুরতে লাগল, অবশেষে অনুপ্রবেশ – কিন্তু কি হল? হয়ত কিছুই না, হয়ত শরীর খারাপ লাগছিল তাই চলে গেছে। আমি কিন্তু এত সহজে

তোমায় ছাড়ছি না মশাই! দাঁড়াও না মজা দেখাচ্ছি! – এত সব ভেবে হিরণ্যা পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

পরদিন বেলা নটা, ইউনিভার্সিটি যাবার সময় হিরণ্যা সোজা চলে গেল গোবিন্দবাড়ি, দাঁড়াল খোলা দরজার সামনে, মামাবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন, মুখ তুলে তাকিয়েই সসব্যস্ত, দাঁড়িয়ে পড়লেন – আরে এস এস , দিদি, ও দিদি দেখ হিরণ্যা এসেছে। বসো বসো।

– না বসবোনা – কুণ্ঠিতভাবে বলল হিরা – ওনার শরীর কি খারাপ ? একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।

ইতিমধ্যে মৃণ্ময়ী এসে দাঁড়িয়েছেন, ব্যস্ত ভাবে বললেন – এসেছ যখন কেন চলে যাবে মা, একটু বসো –

– দেখুন মা, ইয়ে মাসীমা –

– আহা, মা যখন বলেই ফেলেছ, তখন আর মাসীমা কেন! একটু বসো।

– ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি তো তাই, কিন্তু মনটা খুব খারাপ, কি জানি কি হলো ওনার – বলতে বলতে চোখ ছলছল, কথা একটু জড়িয়ে জড়িয়ে নীচু গলায় বলল – চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি –

– তেমন কিছু হয়নি মা, একটু নাকি মাথা ধরেছিল, তার জন্য এমন অভদ্রতা ? আমি তো কাল খুব বকেছি, একটু আগেই বলছিলাম, অফিস যাবার সময় তোমাদের বাড়ি হয়ে যেতে, আর দুঃখ জানিয়ে মাফ চেয়ে নিতে।

– কি যে বলেন মা – হিরা একেবারে ভেজা মাটির মতো – আমি সামান্য মেয়ে, আমার কাছে ...

– গোবু, গোবু – মৃণ্ময়ী ডাকলেন, বললেন – ও তো এখনই বেরোবে –

ফিটফাট সেজেগুজে গোবু সাহেব এসে দাঁড়ালেন, পরনে গাঢ় মেরুন রঙের শার্ট ও ক্রিম রঙের প্যান্ট সাথে ক্রিম রঙের টাই। (ওঃ! ফাটাফাটি লাগছে! ওরে আমার গোবুরে!)

এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল হিরণ্যা, মা এর দিকে তাকিয়ে একেবারে ছোট্ট বালিকার মতো গলা করে বলল – তাহলে আমি আসি মা ?

– আহা, ও তো এখনো কিছু বললই না!

– কদিন ধরেই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, – একেবারে বালিকার মতো গলা হিরণ্যার – সেদিন দাদার সঙ্গে আসছি, তখন উনি বোধহয় অফিস থেকে

ফিরছেন, ভাবলাম দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, তা আমাদের দেখে ঘুরে একটা দোকানে ঢুকে পড়লেন।

— ও একটু মুখচোরা আছে — মামাবাবু ভাগনা বাবুকে আড়াল করতে চাইলেন। — না না আমি খেয়াল করিনি — গোবিন্দ মহা উৎসাহী।

হিরণ্যা পূর্ণ চোখে তাকাল, — তাই বুঝি ?

— যাক গে — মা বললেন — তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়, আর যেতে যেতে কথা বলে নাও।

বিজয়িনী হিরণ্যার মনে পূর্ণিমার জোয়ার! — যাক গে, আপনাকে আর মাফ চাইতে হবে না, আমি এমনি এমনিই মাফ করে দিলুম — পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল সে।

— ইয়ে, আপনি কোন দিকে যাবেন ? — গোবিন্দ উৎসাহী।

— আমি এমন কিছু বুড়ি হয়ে যাইনি যে আমাকে আপনি আপনি করতে হবে।

— ঠিক আছে না হয় তুমি বলা যাবে, বলছি কি এখন তো গাড়ি আসবে আমাকে নিতে, তাহলে আমি পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।

— তাই বুঝি ? ঠিক আছে, তাহলে আজ রাতে আমাদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ, গতকালের অবহেলা আজ পূরণ করে দেবেন, আসবেন তো ?

— নিশ্চয় আসব।

গলির মুখে বড় রাস্তায় ফুটফুটে সাদা রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভার দরজা খুলে দিল, গোবিন্দ সাহেব ডান হাতের ইশারায় মেমসাহেবকে উঠতে বললেন, মেমসাহেব উঠলে তিনি উঠলেন।

গাড়ি গতি নিয়ে নিয়েছে, দু তিনবার চোখাচোখি হলে গোবিন্দ একটু হাসল, তবে অপ্রস্তুতের হাসি, হিরাও হাসল, তবে মুগ্ধতার হাসি।

ড্রাইভার নিশ্চয় কৌতুহলী, কান খাড়া করে আছে কিছু শুনবার জন্য।

গোবিন্দ ফোন বার করে ফেসবুক খুলে মেসেঞ্জারে লিখল — আমি যেন একটা কি, সকলের সাথে ঠিকমতো মিশতে পারি না।

হিরার হাতে ফোন আলোকিত হয়ে উঠল, হিরা দেখল আর মুখ নীচু করে দুলে দুলে হাসল, লিখল — আপনি তো গোবু!

— সবাই তো তাই বলে।

—মানুষ করার জন্য কোন গুবি বুঝি আসেনি জীবনে?

—কই আর।

— যে পাগলিটা এখন বাড়িতে ঢুকে পড়ে জ্বালাচ্ছে? এখন আবার গাড়িতেও ঢুকে পড়েছে? —লিখে নীচু হয়ে দুলে দুলে হাসতে থাকল।

— পুলকিত গোবিন্দ কি লিখবে ঠিক করতে পারছে না, বুকের মধ্যে ছলাৎছল! লিখল— সে তো স্বপ্নের পরী!

—তাই বুঝি?

—তাই তো!

—আমি গবার গুবি!

আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে সিটের ওপর রাখা গোবিন্দর হাতে হাত ছুঁইয়ে গোবিন্দকে হরণ করল হিরণ্যা।

